Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : প্রসঙ্গ ছোটগল্প

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শিরিন আক্তার সরকার
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.3
Pages	৩১-৫৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : প্রসঙ্গ ছোটগল্প

শিরিন আক্তার সরকার*

সারসংক্ষেপ : বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের উন্মাতাল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দীপ্র আবির্ভাব। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পী। তাঁর গল্পে জীবন আপন স্বরূপে উন্মোচিত; গল্পের চরিত্রসমূহ যেন সমবেত জনগোষ্ঠীর প্রতীক। ছোটগল্পের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন, তার তীব্র আলোড়ন ও আর্তি, বিকার, হতাশা ও নৈরাশ্য সবই বিচিত্র ক্যানভাসে অঙ্কন করেছেন তিনি। বর্তমান প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছোটগল্পের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মূলত তাঁর ছোটগাল্পিক শিল্পীসত্তার প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে যে-সব প্রতিভাবান শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁদের অন্যতম। ষাটের দশকের উন্মাতাল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবন তাঁর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। সমাজ ও রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের যে মনোবিকৃতি, তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি প্রদর্শন করেছেন বিরল কৃতিত্ব। তিনি জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, সেভাবে প্রকাশ করবার জন্য নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র ভাষা প্রকরণ। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৭– এই বিশ বছরে তাঁর মোট আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলো হলো : *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬), *খোঁয়ারি* (১৯৮২), *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৫), *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬), *দোজখের ওম* (১৯৮৯), *খোয়াবনামা* (১৯৯৬), *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭) এবং *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (১৯৯৭)। সাতচল্লিশের দেশভাগ, বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসন, বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ, পঁচাত্তরের অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামরিক শাসন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রভৃতি ঘটনা-দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে ইলিয়াসের সাহিত্যস্বভাব। তাঁর রচনায় সময় ও সমাজের প্রতিটি স্পন্দন, তার তীব্র আলোড়ন, বিকার, হতাশা ও নৈরাশ্য সবই মনস্ক পাঠক অনুভব করেন। লক্ষণীয় যে : "সেই অনুভূতি মুগ্ধতা আনে না, ভাবাবিষ্টও করে না, তা পাঠককে বাংলাদেশের জলবায়ু-মাটি-মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়; এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-সূত্রে তার আত্মপরিচয়ের সন্ধানও করে।" (আলাউদ্দিন, ২০০৯ : ১৪৮) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বহুপ্রজ লেখক নন, প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি লিখেছেন মোট তেইশটি গল্প – এমনই স্বল্পপ্রজ এই শিল্পী। কিন্তু "তাঁর রচনার স্বল্পায়তন তীরভূমি এক ঝাঁক সবুজের প্রাণময় স্পর্শে শিল্পসুন্দর, উজ্জ্বল ও সজীব। বাংলাদেশের আদি ও অকৃত্রিম বিষয়গুলোই গদ্যের নতুন ধারায় ও নতুন রচনাকৌশলে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর লেখায় প্রাণ পায়" (আজহার, ১৯৯৬ : ৪৭৯)। প্রসারতা দিয়ে যেমন গভীরতা মাপা সম্ভব নয়, তেমনি লেখনীর পরিমাণগত তথ্যের ভিত্তিতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রতিভার মূল্যায়ন অসম্ভব। সংখ্যাগত হিসেবে নয় বরং গুণগত মানের প্রশ্নে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে তাঁর অবদান তুলনারহিত। পুরোনো ঢাকার ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, স্বার্থপরতা এবং জীবনসংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পভুবন। তাঁর গল্পের মানুষজন রাজধানী ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত অট্টালিকাবাসী থেকে শুরু করে রিক্সাচালক, ট্রাক ড্রাইভার, কবরখোদক, পাগল, নেশাখোর এবং গ্রামের সাধারণ মানুষজন, চাষি, কলু, নাপিত, মাঝি, রাজনীতিবিদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নগরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনের বঞ্চনা-অসহায়ত্ব, মধ্যবিত্তের কৃত্রিমতা, অন্তঃসারশূন্যতা, অতৃপ্তি, আত্মদ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক নেতাদের হঠকারিতা, মনোবিকার ও স্বার্থপরতার চিত্রটি সমূলে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পের বিচিত্র ক্যানভাসে।

আখতরুজ্জামান ইলিয়াসের এমন কিছু গল্প আছে যেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অগ্রন্থিত এরকম সাতটি গল্প বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে অন্যান্য লেখার সঙ্গে *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*শিরোনামে প্রশান্ত মৃধার গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় প্রকাশ করে ঐতিহ্য প্রকাশনী। গল্পগুলো হলো 'বংশধর', 'তারাদের চোখ' 'অতন্দ্র', 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ', 'চিলেকোঠায়' এবং 'পরিচয়'। এ গল্পগুলি ছাড়াও 'সন্ত' এবং 'ঈদ' নামে আরো দুটি অগ্রন্থিত গল্প *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার ছোটদের পাতা 'মুকুলের মাহফিল' থেকে সংগৃহীত। খালিকুজ্জামান ইলিয়াস সম্পাদিত এবং মাওলা ব্রাদার্স থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ প্রকাশিত *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ৪*-এ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস লিখিত ভূমিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এই গল্প দুটিই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রাপ্ত গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। অগ্রন্থিত গল্পগুলোর অধিকাংশই ইলিয়াস গ্রন্থাকারে প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন

না; বরং প্রবলভাবে বিরোধিতাই করতেন। কিন্তু বাস্তবে "মৃত্যুর পর লেখক আর তাঁর রচনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। বেগানা হাতে পড়ে তারা যেমন বিভিন্নভাবে পঠিত এবং বিশ্লেষিত হয়, তেমনি লেখকও হয়ে যান একীভূত তাঁর পাঠকের সারিতে। অশরীরী অবয়বে পাঠকের কি সম্পাদকের কি প্রকাশকের কাতারে দাঁড়িয়ে লেখক অসহায়ভাবে দেখেন তাঁর লেখা নিয়ে পাঠকের/ সম্পাদকের/ প্রকাশকের মচ্ছব। জীবিত মানুষের মস্তিষ্কে তিনি জারিত হন, আবার নতুন প্রাণও পান। এবং এভাবেই একাত্ম হন পাঠকের মননে। যে-কোনো গতায়ু লেখকের মতো ইলিয়াসের ভাগ্যেও এমনটিই ঘটেছে।" (খালিকুজ্জামান, ২০০৭ : ভূমিকা)

অগ্রন্থিত এসব গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চেতনার ক্রমবিকাশের সূত্রটিকে জানার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। তরুণ বয়সে প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে লেখা, অবসর সময়ের লেখা, হেলা-ফেলা করে লেখা, আঙ্গিক শব্দচয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন থেকে লেখা, ছোটদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা বিবেচনায় রেখে লেখা – ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্য দিয়ে ইলিয়াসের মানসিক বিবর্তনের যে ধারা তারই একটি পরিচয় *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*-এ প্রকাশিত গল্পগুলোর ভেতর গিয়ে আভাসিত হয়েছে।

অগ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে 'সন্ত' ও 'ঈদ' গল্পে গল্পকার ইলিয়াসের প্রাথমিক প্রস্তুতি লক্ষ করা যায়। ভাষা এবং কাঠামোর, চরিত্র এবং সংলাপের একটা নড়বড়ে কিন্তু একই সঙ্গে সচেতন নির্মাণ প্রয়াস গল্প দুটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দুটি গল্পের পর সম্ভবত বিদেশি গল্পপাঠের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় 'বংশধর' এবং 'তারাদের চোখ' গল্প দুটোয়। কাহিনি-প্রধান হলেও এই গল্প দুটিতে কাহিনি এবং চরিত্র ক্রমেই জটিলতর হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায় এবং গল্পকারও যেন কাঁপা হাতে তাদের আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। এরপরের তিনটি গল্প – 'অতন্দ্র', 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' ও 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ'-এর মধ্য দিয়ে লেখকের হয়ে-ওঠার সম্ভাবনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ভাষা, বাক্যগঠনরীতি, শব্দচয়ন ইত্যাদি যেন গল্পের কাঠামোকে ছাপিয়ে উঠেছে। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও লেখকের সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় গল্পগুলোর বিন্যাসে। এই গল্পত্রয় ইলিয়াসের কোনো সংকলনে স্থান না পেলেও বিষয়বস্তু ও কাঠামোগত সাদৃশ্যের কারণে লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬)-এর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পের সঙ্গে সংযোজিত করে এদের আলাদা একটি গল্পসংকলন হিসেবে বিন্যস্ত করা যেত। তারপরেও পরিণত ইলিয়াসের শৈলী, চেতনাগত ধারণার বোধটিকে এ গল্পগুলো তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারেনি, যেমনটি পাওয়া যায় 'চিলেকোঠায়' এবং 'পরিচয়' গল্পদুটোতে। ইলিয়াসের পরবর্তীকালের অনেক গল্পেরই প্রারম্ভিক রেশ পাওয় যায় এই গল্প দুটিতে। অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত গল্পগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা মূলত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পরিণত ছোটগাল্পিক সত্তার পূর্ববর্তী স্তরের স্থান,

কাল, চরিত্র সম্পর্কে লেখকের বোধের জগতটিকে সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনার প্রয়াস পাবো।

দুই

'সম্ভু' গল্পটি আবর্তিত হয়েছে গলাচিপার এক নাপিতকে কেন্দ্র করে; যাকে সবাই সম্ভু নাপিত হিসেবে চেনে। সম্ভু নাপিতের তদারকিতে আপাত শহরবাসী স্কুল-বালক আতিকের চুল কাটার প্রসঙ্গ এবং আতিকের অভিজ্ঞতাসূত্রে গ্রাম ও শহরের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিবরণও প্রদত্ত হয়েছে এ-গল্পে। ছুটিতে শহর থেকে গ্রামে আসলেই আতিক চুল কাটায় সম্ভু নাপিতের হাতে। গ্রামের বেশির ভাগ লোকের চুল কাটার দায়িতও সম্ভু নাপিতের। যদিও এই সম্ভু নাপিত শহরের সেলুনের মতো ফ্যাশনদুরস্ত করে চুল কাটতে পারে না, তবুও আতিক গ্রামের সম্ভু নাপিতের কাছেই চুল কাটিয়ে যেন স্বস্তি অর্জন করে। সম্ভু নাপিত কেবল যে চুলই কাটে তা নয়, বরং চুল কাটার ফাঁকে ফাঁকে সে নানা রকমের গল্প করতে ভালোবাসে। সেসব গল্পে উঠে আসে অতীতের নানা প্রসঙ্গ, তার চুল কাটার পারঙ্গমতা প্রভৃতি বিষয়। গল্পে সম্ভু নাপিতের বর্ণিত গল্পের নমুনা এরকম :

> ২৫/২৬ বছর আগে কোন এক বিলেতি সায়েব এসে উঠেছিলেন গলাচিপার ডাক-বাঙলোতে। সায়েবের দরকার হল দাড়ি কামানোর। ডাক পড়ল সম্ভু নাপিতের। বাবা! এ তল্লাটে কে আছে, যে সম্ভু নাপিতের চেয়ে ভাল চুল কাটে? সম্ভুকে দেখে সায়েব খুশি হয়ে পরদিন ভোরে এসে তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেবার জন্য বললেন। সে সময় সম্ভুর বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। খুউব ভোরে– শেষ রাত থাকতেই সম্ভু ঘুম থেকে উঠল ক্ষুর-টুর খুব ভালরকমে ধার দিয়ে, গোসল-টোসল করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সে গেল সায়েবের কাছে। তখনও সায়েব ঘুম থেকে উঠেনি। উঠতেও অনেক দেরি। ... সম্ভুর কি খেয়াল হয়, চুপ চুপ করে সায়েবের শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত সায়েবের গালে ক্ষুর লাগিয়ে মসৃণ করে কামিয়ে দেয় তাঁর মুখ; দিয়েই ভয়ে দৌড় দিল ঘর থেকে।

সায়েব ঘুম থেকে উঠে টের পান তাঁর দাড়ির অস্তিত্বহীনতার কথা। কে কামিয়ে দিল? সবাই গিয়ে ধরে আনল সম্ভু নাপিতকে । ভয়ে ভয়ে সম্ভু এল। সায়েব খুব খুশি হয়ে দশ টাকার একখানা নোট ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। ('সম্ভু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৪)

এভাবেই চুল কাটতে কাটতে সম্ভু নাপিতের গল্প বলার মধ্য দিয়ে তার দক্ষতা, নৈপুণ্য বিবৃত হয়। কেবল তাই নয় তার গল্পে উঠে আসত দেশের অতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর সচ্ছলতার কিছু টুকরো ছবি : "বুয়েছ কি না, আতিক ভাই, ষোল বছর আগেও আমি নিজে কুমড়োতলার হাট থেকে সাত টাকা মন দরে চাল কিনেছি মা গো! দুই পয়সা হালি পর পেঁয়াজ, আদা, মরিচ সবই কিনতি ...!" ('সম্ভু',

রচনাসমগ্র-৪, ২০০৭ : ১৪)। আতিক বোর্ডিং-এ দেখেছে তার রুম-মেটরা সব বাড়ি যাবার আগে আগে সেলুন থেকে চুল কেটে নিতো। অনেককে বলতে শুনেছে : "এই ব্যাটা গাঁয়ের নাপিতগুলো চুলটুল কিছু কাটতে পারে না, না আছে ঢঙ, আর না আছে একটা স্টাইল। তাইত এখান থেকেই চুলটুল কেটে নিয়ে যাই।" ('সন্তু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৩) শহরে এসে আতিকেরও বেশ-ভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। রুম-মেটদের কথা তার মনোলোকেও ক্রিয়া করতে থাকে। অবশেষে "আতিকের কি মনে হল সেও ছাটবে ওমনি করে তার চুল। মনোয়ারকে দেখে তার চুল-কাটা ভালরকমে পরখ করে নিয়ে আতিকও স্থির করে ফেলে যে সেও এবার বাড়ি গিয়ে সন্তু নাপিতকে দিয়ে ঠিক অমনি করেই চুল কাটাবে।" ('সন্তু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৪) কিন্তু বাড়িতে আসার পরে দেখা গেল, সন্তু নাপিত কোনোভাবেই আতিকের চুল শহরের মতো ফ্যাশন করে কাটতে পারছে না। তাই আতিক তার কাছে আর কখনও চুল কাটাবে না এ কথা বলার পরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সন্তু নাপিত চলে গেল। এমনকি গভীর বেদনা ও অভিমানে সন্তু নাপিত তার এতদিনের পেশা চুল কাটাই ছেড়ে দিলো। এরপর শহরে গিয়ে আতিক সেলুনে যায়, আর সেখান থেকে সামনের দিকে বড় আর ঘাড়ের ওখানটায় ছোট করে 'এলবার্ট ছাট' ছেটে সে যখন ফেরে তখন তার ক্লাসের বন্ধুরা অবাক হয়ে বলে ওঠে : "গুড্, গেঁয়ো চুল-ছাটা ছেড়ে দিয়ে আতিক আজ অনেকটা কালচারড হয়েছে।" ('সন্তু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৪)। এভাবেই কালচার হওয়ার মধ্য দিয়ে আতিক যেন তার শেকড় থেকেই দূরে সরে গেছে। নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ, মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় মিশে আছে এই সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের নাড়ির সঙ্গে। একে অস্বীকার করা মানে নিজের অস্তিত্বকে অবহেলা করা, অস্বীকার করা। সন্তু নাপিত এ গল্পে নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্যবোধ আর অভিরুচির প্রতীক হয়ে ওঠে। ফলে স্বভাবতই আতিকের মন থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় পূর্বের সেই প্রশান্তি। তার আর কিছুই ভালো লাগে না। তার কেবল মনে পড়ে : "যদিও চুলটা ছেটেছে ভালই, তবু সন্তুর কাছে কি যেন আছে। তার কথাগুলো ভারি সুন্দর, কত গল্পই করে।" ('সন্তু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৪) কালচার হওয়া মানে নিজের অতীতকে, পরিচয়কে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করা নয়। নিজের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি একাত্ম হয়ে বৈশ্বিক জ্ঞানের আলোয় নিজের, দেশের ও দশের যথার্থ মঙ্গল কামনা এবং তাতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখাই প্রকৃতপক্ষে কালচারড হওয়ার পূর্বশর্ত। এই বোধ গল্পের শেষ পর্যায়ে আতিক চরিত্রে জেগে উঠলে সে এরপর বাড়ি আসার সময় আর শহরের সেলুন থেকে চুল কেটে আসে না। সন্তু নাপিতের হাতেই চুল কাটাবে বলে সে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। কিন্তু : "ট্রেন থেকে আতিক দেখে ধানক্ষেত, সর্ষের ক্ষেতগুলো খা-খা করছে। বড় আকাল হচ্ছে এবার। স্টেশনে নেমে দেখে, উঃ! এই কি গাঁয়ের অবস্থা! কত লোক

ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আসে। ঐ তো সন্তুর মেজ ছেলেটা আর তার মা ভিক্ষের টিন হাতে" ('সন্তু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৫)। বাড়ি ফিরে সন্তু নাপিতের খোঁজ করলে সে জানতে পারে যে, তিনদিন কিছু খেতে না পেয়ে সন্তু নাপিত মারা গেছে। তার ছেলেমেয়েরা ভিক্ষেয় বেরিয়েছে এখন। এ খবরে আতিক মুষড়ে পড়ে। এক রকমের অপরাধবোধ তার মনে দানা বাঁধে। দেশের সার্বিক আকাল, অভাব-দারিদ্র্যের নির্মম অবস্থা গল্পে আভাসিত হওয়ার পাশাপাশি শেকড়ের টানে ফিরে আসা মানুষের আকুতি ও মনোবেদনা গল্পে লেখক যেন আতিকের ভাবনায় জারিত করে উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> আতিক এখন সেলুনেই চুল কাটে। এখানে গেঁয়ো আলোচনা হয় না। আগন্তুকরা গল্প করে চলচ্চিত্র নিয়ে, কেউ কেউ ঝগড়া করে রাজনীতি নিয়ে, ... সন্তু নাপিত চলচ্চিত্র নিয়ে কিছুই জানত না, ক্রিকেটের নামও বোধ হয় শোনেনি, প্রধানমন্ত্রী কে বলতে পারত না, ... কিন্তু কি যেন আছে তার কাছে চুল কাটানোর মধ্যে। কত কথা, গ্রামের পুরনো গল্প সাধারণ জীবনযাত্রা, সেসব শুনতেই যেন ভাল। ... সে পড়ায় মনই দিতে পারে না, কেবল মনে করে সন্তু নাপিত, ত্রিমোহিনী আর গলাচিপার কথা, সন্তু যেন এসে আবার চুল কাটতে শুরু করে আতিকের। ('সন্তু', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৫)

এভাবেই আতিকের ভাবনায় লেখক আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্যবোধকে অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের শেকড়ের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেই হবে। নিজের যা কিছু আছে, হোক না তা তুচ্ছ, মূল্যহীন – তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং এর পরিচর্যার মধ্য দিয়েই প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা ধ্বনিত হতে দেখা যায় 'সন্তু' গল্পটির মধ্য দিয়ে।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের উৎসব হচ্ছে দুই ঈদ; ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। ঈদ অর্থ খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। মানুষ সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ঈদে আনন্দ করবে, সবাই এক কাতারে ঈদের নামাজে দাঁড়িয়ে মানবতা ও সাম্যের জয়ধ্বনি তুলবে, আহার-বিহার করবে – এটাই স্বাভাবিক দৃশ্যপট। কিন্তু হত-দরিদ্র-নিরন্ন মানুষ ঈদে এই স্বাভাবিক দৃশ্যপটের কোথাও স্থান পায় না। সমাজের অবহেলিত, দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত মানুষের জীবনে ঈদ কোনো বিশেষ সুখ বা স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করে না, বরং হত-দরিদ্র মানুষের নিগ্রহ আর বঞ্চনার মর্মযাতনাকে যেনো কয়েকগুণ বেশি বাড়িয়ে দেয়। এরকম মানুষের জীবনকাহিনি নিয়েই 'ঈদ' গল্পটি রচিত। 'ঈদ' গল্পের মধ্য দিয়ে দরিদ্র-বঞ্চিত-অবহেলিত নিরন্ন মানুষের ক্ষোভ, হতাশা ও নীরব প্রতিবাদই ঘোষিত হয়েছে।

বশির চৌধুরীর বাড়িতে ঠিকা ঝি-এর কাজ করে রজবের মা ফাতিমা। ভোর থেকে শুরু করে সারাদিন চৌধুরী বাড়িতে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম শেষ

করে রাত এগারোটার দিকে ফাতিমা তার নিজ ঘরে ফিরে আসে। ঘর মানে বস্তি এলাকার একটা স্যাঁতসেতে অন্ধকার খুপরি। রজবের বাবা খুলনার এক মিলের শ্রমিক। ছুটিছাটার মধ্যে এখানে এসে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে থাকে। রজবের বাবার ছুটি-ছাটাও যে কর্তাব্যক্তিদের মর্জির ওপর নির্ভর করে তা ঈদের সময়েও তার ছুটি না-পাওয়ার মধ্য দিয়ে লেখক ইঙ্গিত করেছেন এ গল্পে। মিল, কল-কারখানার চাকা সচল রাখতে যেসব দরিদ্র শ্রমিক দিনরাত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে চলে, তাদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার কথা মালিকপক্ষ ভাবেই না; তারা কেবল নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির চিন্তায়ও স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে। ফলে এসব শ্রমিক মানুষ নামধারী যন্ত্রে পরিণত হয়। রজবের বাবা সেই অগণিত যন্ত্র-মানবদের একজন। ঈদের দিন তাই ছেলে রজবকে সঙ্গে নিয়ে ফাতিমা চৌধুরী বাড়িতে আর দশদিনের মতোই কাজে যায়। চৌধুরী বাড়িতে বাকি সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার স্বপ্নে আপ্লুত থাকে সে। কিন্তু বাস্তবতা অন্যরকম। বিলম্বে আসার কারণে ঈদের দিন সকালেই ফাতিমাকে চৌধুরী গিন্নির গালমন্দ খেতে হয়। এমনকি ছেলে রজবের জন্য বহু অনুনয়-আরাধনার পরে একটি কলার-ছেঁড়া জামা তার ভাগ্যে জোটে। রজবকে সামান্য একটু ঈদের দিনের সেমাই খাওয়ানো নিয়েও গিন্নির অকথ্য কটুকাটব্য হজম করতে হয় ফাতিমাকে। এখানেই শেষ নয়, চৌধুরী বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপহাসের পাত্রে পরিণত হয় রজব। ছেঁড়া জামা পরা রজব চৌধুরী বাড়ির নতুন জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়েদের সামনে হাজির হলে সৃষ্টি হয় এক ভিন্ন পরিবেশ। যে পরিবেশের বর্ণনা গল্পে উঠে এসেছে এভাবে : "শাহেদ বলে, 'দেখেছ সবাই? ওর জামাটায় একটা বোতামও নেই! ওরে ছোড়া, বোতাম ক'টা খেয়েছিস, না?' আর একজন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এঃ, কি চুলছাটা! টুপিও নিস নাই একটা?' জামিল তার পায়ে ল্যাং মেরে বলে, 'হাফপ্যান্ট পরে কি নামাজ হয় রে ছোড়া?" ('ঈদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৭)। এই রকম উপহাসের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে সমাজের নিম্নবর্গের অসহায়, দরিদ্র, বঞ্চিত, নিরন্ন মানুষের জীবনের মর্মন্তুদ ইতিকথা। সমাজের তথাকথিত উচুঁ শ্রেণির মানুষেরা, যাদের নির্মম কপটতা, ভণ্ডামি আর স্বার্থপরতার যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত এইসব অসহায় মানুষের নির্মম বিধিলিপি পদদলিত হচ্ছে; তাদের অবস্থান, মানসিকতা, চরিত্রের বিশ্বাসহীনতা ও সর্বোপরি স্বার্থপরতার মুখোশটি উন্মোচিত হয়েছে চৌধুরী গিন্নি, ও তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে। একই সঙ্গে সমাজের নিম্নবর্গের নিরন্ন মানুষের ভেতরে জমে থাকা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে রজব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ঈদের দিন দেরিতে আসার কারণে চৌধুরী গিন্নির মুখঝামটা এবং কটূক্তি শুনে তাই রজবের মনে হয় :

> 'আম্মাটাও কেমন – এত কথা হজম করতে পারল!' আবার রজবের জন্যে গিন্নীর কাছে একটা জামার জন্য তার মায়ের আকুতি ও অনুনয়ে 'রজবের ভয়ানক লজ্জা

> আর রাগ হতে লাগল।' অন্যদিকে সেমাই খেতে দিয়ে দ্রুত তা শেষ করার জন্য তার মা তাড়া দিলে রজব ভাবে, 'গিন্নীর ভয়ে খাওয়া চলবে না? কার টাকায় ধনী চৌধুরী সাহেব?' এর মধ্যেই গিন্নীর পায়ের শব্দ শোনা যায়। 'জলদি উঠ, বাইরে যা!' না, উঠবে কেন রজব? কি তার অপরাধ? ('ঈদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৭)

কেবল তাই নয়, চৌধুরী বাড়ির ছোট ছোট নতুন জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়েরা রজবকে নিয়ে উপহাস করতে থাকলে তার সমস্ত পুঞ্জিভূত রাগ বাঁধ ভেঙে পড়ে। সে লাফিয়ে পড়ে জামিলের ওপর – গায়ের শক্তি রজবের অনেক বেশি। এরকম বর্ণনায় সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত-শ্রেণির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত অসহায় বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। এই সব মানুষের গায়ের শক্তি যত বেশিই থাকুক না কেন প্রতিবাদের জন্য যথার্থ মানসিক মনোবল তাদের থাকে না। প্রতিনিয়ত অবহেলিত হতে হতে অসহায়ত্বকেই তারা নিয়তি বলে মেনে নেয়। তাই গল্পেও রজব এই সমাজ-সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। কেননা : "ওপরতলা থেকে গিন্নী দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন। রজবের চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে থাকেন চড় – ঠাস, ঠাস, ঠাস। বাড়ির সমস্ত লোক ছুটে আসে, নির্দয়ভাবে মারতে থাকে তাকে। চাকরানির ছেলে হয়ে গায়ে হাত তোলে মনিবের ছেলের? এত বড় অপমান সহ্য করবে 'বনিয়াদি' চৌধুরী পরিবার!" ('ঈদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৭) ফলে রজবের মতো নিম্নবর্গের মানুষেরা কেবল মারই খায়। তাদের সব অভিমান, বেদনা-ক্ষোভ, প্রতিবাদের প্রচেষ্টা যেন শুরু হতে না-হতেই শেষ হয়ে যায়। ফাতিমা তাই এই গল্পের মধ্য দিয়ে বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের অসহায়ত্বকে যেমন ধারণ করেছে তেমনি চিরন্তন মাতৃত্বেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় :

> অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে ফাতিমা। মাটির পিদিমটা জ্বালিয়ে ঘুমন্ত ছেলের মুখটার দিকে চেয়ে দেখে কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়েছে সে। ফাতিমা শুয়ে পড়ে। রজবকে কাছে টেনে নেয়। হু হু করে কেঁদে ওঠে ফাতিমা। পেটের দায়ে তাকে ছেলের ঈদ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিতে হয়। রজব জেগে যায়। আম্মা কি আবার আগের আম্মাই হয়ে গেছে! তার আম্মা কেঁদেই চলে। ('ঈদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৭)

গল্পের একদম শেষ মুহূর্তের বর্ণনায় মূর্ত হয়েছে সমাজে বিরাজমান শ্রেণি-বৈষম্যের নগ্নরূপ এবং নিরন্ন মানুষের মর্মন্তুদ হাহাকার ও অসহায়ত্ব : "বারোটার পর থেকে ঈদের দিন চলে গেল। ভালই হল। কোন দরকার নেই ঈদের। রজবেরও না, তার আম্মারও না" ('ঈদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৭)। 'ঈদ' গল্পে শব্দ আর ঘটনার ইঙ্গিতময় বিবরণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যেন পাঠককে পৌঁছে দেন এক চেনা জগতে; বঞ্চনা আর বিড়ম্বনাই যেখানকার নিত্যদিনের চিত্র।

'বংশধর' গল্পে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কেমন করে, কীভাবে মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তা প্রেম, বিবাহ, সন্তান-জন্মদান প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ার জটিলতায় প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উপরন্তু মৃত্যুচেতনার বয়ানে কখনও জটিল কখনও-বা সরল হয়েছে গল্পের ধারাভাষ্য। মানুষের জীবনের নানাবিধ জটিল সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য চিত্রায়ণ এই 'বংশধর' গল্পটি। জর্জ উইলিয়াম পেরিথ ও তার স্ত্রী মেরীর জীবনকাহিনির কিয়দংশ বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। জর্জ উইলিয়াম পেরিথের স্ত্রী মেরী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে একটি স্যুটকেসে তার বাবার ডায়েরি খুঁজে পায় মেরী। অতিথি সৎকারের জন্য ডায়েরিটি নির্দিষ্ট সময়ে পড়া হয়ে ওঠেনি তার। পরদিন স্যুটকেসের পাশে প্রাপ্ত ডায়েরি পড়ে মেরী জানতে পারে যে, সে তার বাবার পালিত কন্যা এবং হিন্দু বংশীয়। এই ঘটনায় মেরী বিমূঢ় ও বিমর্ষ বোধ করে। নিজেকে তার অশুচি এবং অপরাধী মনে হতে থাকে। হাসপাতালে স্বামী কিংবা ভাইকে সে সহজভাবে আগের মতো গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় :

> ইনজেকশন দেবার কিছুক্ষণ পর নিমীলিত আঁখি খুলে ফেলল মেরী। মুখ আর বুকের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেন মিস্টার পেরিথ। মেরী চমকে উঠল যেন। হাত দিয়ে ঠেলে দেয় তাঁকে, আতংকভরা দৃষ্টিতে তাকায় চারদিকে। ...'মেরী!' স্নেহভরা সম্ভাষণ মিস্টার পেরিথের, 'সোসাইটির সবাই খুব দুঃখিত তোমার এ খবর শুনে। কাল বিকেলে রেভর‍্যান্ড জ্যাক আসছেন দেখতে! তোমার ফ্রেন্ডসদের মধ্যে মিসেস কষ্টার, মিস উইলিয়াম আসছেন।' ...
>
> —না, না। তুমি বারণ করে দেবে আসতে। কোনো ক্রিশ্চিয়ান যেন আসতে না পারেন। ...তোমরাও এসো না! তোমরাও না। আমি খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান নই। আই হ্যাভ'ন্ট কাম অফ পেরিথ ফ্যামিলি! ('বংশধর', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ১৮-১৯)

এভাবেই ধর্ম-বর্ণ-গোত্রগত ভেদবুদ্ধি জর্জ উইলিয়াম আর মেরীর এতদিনকার মধুর দাম্পত্য জীবন, আনন্দপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস আর মূল্যবোধকে নাড়িয়ে দেয়, যা অতিক্রমের মতো মানসিক দৃঢ়তা তার ছিলো না। ফলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেন তার অপরাধবোধের মুক্তি ঘটে। গল্পের শেষাংশে জানা যায় যে মেরীর পঠিত ডায়েরিটি প্রকৃতপক্ষে উইলিয়ামের এক বন্ধুর, যা সে ভুল করে ফেলে গিয়েছিলো। আর তার বাবার ডায়েরি বলে অনুমিত বইটি বাইবেল সম্বন্ধীয়, যেটি স্যুটকেসেই অক্ষত ছিলো। 'বংশধর' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সার্থক গল্পের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। গল্পে উঠে এসেছে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টান-পাদ্রীদের ধর্ম-প্রচারের কথা, যা লেখকের আসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ :

> লর্ড হেরিক পেরিথ। পেরিথ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিলেতে স্বীয় ধর্ম প্রচারকল্পে প্রচেষ্টা, এর প্রতি অগাধ আনুগত্য প্রভৃতির জন্য রেভর‍্যান্ড পেরিথ হলেন সরকার থেকে লর্ড। লর্ড ক্লাইভের সাথে বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরই সাহায্যে আপনাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন এদেশে। নিষ্ঠা ছিল। আত্মসংযমও। বিশেষত নিম্নশ্রেণিভুক্ত উৎপীড়িত হিন্দু জনতা গ্রহণ করল এ ধর্ম দলে দলে। ('বংশধর', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ২০)

ধর্মের অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে আলোকে দলে দলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা উদ্বুদ্ধ হলো, সেই চেতনার যথাযথ মর্মার্থটি মেরীর বোধের অগোচরেই যেন থেকে গেলো। ধর্মবোধ নিয়ে, বংশগত মর্যাদার প্রশ্নে সকল মানবিক সম্পর্ক তার কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লো। দ্বিধান্বিত বোধের কাছে জীবনের যেন পরাজয় হলো। মৃত্যুই হয়ে উঠলো তার সমস্ত বিভ্রান্তি, সংশয় থেকে মুক্তির একমাত্র অবলম্বন।

জগতের সকল সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মূলে প্রেম, বিরহ, শোষণ, লাঞ্ছনা কোনো-না কোনোভাবে জড়িত। আর এর নেপথ্যে একজন নারীর নাকি ভূমিকা থাকে জোরালো; এরকম বক্তব্য অনেক সমালোচকই উচ্চারণ করেছেন। কারণ, নারীর কারণেই পৃথিবীতে অনেক অনর্থপাত হয়েছে। কিন্তু একথাও অধিকতর সত্য যে, নারী তার প্রেমে-পবিত্রতায়, গুণে-মানে ভরে দিয়েছে পুরুষের জীবন-মন। নারীর ভালোবাসা পুরুষকে করেছে প্রেমিক, যোদ্ধা এবং সৃষ্টিশীল। নারীর ঘৃণা অথবা ভালোবাসা সকল যুগে, সকল কালে মানুষের জীবনে আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামও নারীর অবদান প্রসঙ্গে বলেছেন :

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল। ....
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী
সুষমা-লক্ষ্মী, নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।...
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
(কাজী নজরুল, ২০০৭ : ১৭)

সংসারে নারীর ভূমিকা, তার প্রভাব, নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানামাত্রিক মানবিক জটিলতা এবং সম্পর্কের টানাপড়েন – প্রভৃতি অনুষঙ্গের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'তারাদের চোখ' গল্পে। এই গল্পে নায়কের মৃত্যুর নেপথ্যে তার অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা অনেকাংশেই দায়ী। কাইয়ুম আত্মহত্যা করে পানিতে ডুবে। সান্ত্বনা ভালোবাসতো তাকে। একদিন রিক্সায় কাইয়ুমকে অন্য নারীর সঙ্গে ঘুরতে দেখে সান্ত্বনা। এতে সম্পর্কের ভিত নড়ে যায়। সান্ত্বনার সঙ্গে নতুন করে প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে কামালের; যা গল্পে বর্ণিত হয়েছে এভাবে : "কামালের হাত ওর পিঠের ওপর। সান্ত্বনাও মুখের সমস্ত অভিব্যক্তিতে একজন প্রেমিকাকে ফুটিয়ে তুলছে। এই সময় কাইয়ুম এল। ও নিশ্চয়ই দেখেছে এদের দু'জনকেই। কিন্তু কোনো কথা না বলে বড় ভাইয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।" ('তারাদের চোখ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ২৫)কাইয়ুমের মৃত্যুকে আত্মহত্যা ভেবে সান্ত্বনা নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করে। তার কেবলই মনে হয় – কামালের অন্তরের গোপন অনুভূতিকে সে কেন ভুল ব্যাখ্যা করলো; ভুল বুঝে কেনই-বা অভিমান করে

নিজেকে জড়িয়ে ফেললো কামালের সঙ্গে। গল্পে সান্ত্বনার মানসিক অনুতাপের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে :

> কাইয়ুম! তুমি না শিল্পী! তুমি না ছবি আঁক কাইয়ুম! কেন তুমি মানুষের মন বোঝ না। কেন তুমি আমাকে ডেকে নিলেনা আড়ালে! কামালকে আমার সাথে দেখলে তুমি কষ্ট পাবে, আমাকে জানাওনি কেন কাইয়ুম! কেন তুমি তোমার বুকের মধ্যে নিয়ে আমাকে আদর করলে না ! ... কামাল মাত্র আটদিন প্রেম করেছে আমার সাথে। আটদিন পরেই আব্বাকে বিয়ের কথা বলেছে। তুমি দীর্ঘদিন ধরে শুধু প্রেমই করেছ কাইয়ুম। তা স্থায়ী করার ব্যবস্থা করার চিন্তাও করনি। ('তারাদের চোখ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ২৫-২৬)

সান্ত্বনার মানসিক এই টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, নানামুখী প্রবণতার দোলাচল, মানবমনের বিচিত্র গতিবিধির স্বরূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরে ঘটনাক্রমে জানা যায় যে ডেজী নামের ঐ মেয়েটি, যাকে সান্ত্বনা কাইয়ুমের সাথে ঘুরতে দেখেছে, সে ছিল কাইয়ুমের জীবনে ভালোবাসার চতুর্থ নারী। কাইয়ুম ছিল সাঁতারে অদক্ষ; তাই প্রকৃতপক্ষে পানিতে ডুবেই তার মৃত্যু ঘটে। এ পর্যায়ে এসে গল্পের কাহিনি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। প্রেম, বিশ্বাস, বন্ধন, আস্থা ও গভীরতা প্রভৃতি অনুষঙ্গের নতুনতর বিন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্কের নানামুখী জটিলতা মানব-মনের চিরায়ত রহস্যের দ্বারটিকেই যেন প্রতিবিম্বিত করে তোলে। পরিশেষে গল্পের পরিণতি নান্দনিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গল্পটিতে ইলিয়াস যে দ্বন্দ্বময় আবহ তৈরি করেছেন তাতে পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গল্প-নির্মাণ দক্ষতা :

> মৃত্যুর দিনও কাইয়ুম আর ডেজী ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষার প্রেম করেছে প্রচলিত ঢঙে। আরো অনেকের মতো এই মানসিক বিলাসটুকু কাইয়ুমের ছিল। সান্ত্বনা তৃতীয় আর ডেজী চতুর্থ – যারা এই বিলাসের পাইপে তামাক পূরত। সান্ত্বনা এসব জানত না। ... দীর্ঘকাল পরে পুকুরে নেমে অশান্ত হয়ে উঠেছিল কাইয়ুম। সাঁতারে নিজের চরম অপটুতার কথা বিস্মৃত হয়েছিল সাময়িকভাবে। ... যদি সান্ত্বনা জানত, তবে আকাশের পানে তাকিয়ে মিটমিট করা অযুত তারার চোখে কী দৃষ্টি দেখতে পেত – আমার জানা নেই! ('তারাদের চোখ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ২৮)

বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থার চরম ভগ্নদশা তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'অতন্দ্র' গল্পে। এর পাশাপাশি ভগ্নস্বাস্থ্য ও অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার চমৎকার বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, অস্তিত্বের সংকটে জর্জরিত মানবাত্মা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যকার মেরুদূরত্বে তৈরি বিকৃতি ও অসহায়ত্ব যেমন রূপায়িত হয়েছে তেমনি গোটা দেশ-জাতির স্বাস্থ্যহীনতার কথা চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে 'অতন্দ্র' গল্পের মাধ্যমে।

বসন্ত-আক্রান্ত স্বপন মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি। তার চোখে ঘুম নেই। নানা স্বপ্ন-কল্পনা-দুঃস্বপ্ন এসে ভিড় করে তার মস্তিষ্কে। কর্তব্যরত ব্রাদার স্বপনের কাছ থেকে মার্কিনি ম্যাগাজিন পড়তে নেয়। নিদ্রাহীন স্বপন ঘুরেফিরে নিচতলায় গেলে ব্রাদারকে আত্মমিথুনরত অবস্থায় দেখতে পায় সে। স্বপনের শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে ঘুমের ঔষধ গ্রহণ করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপনের মগ্নচৈতন্যে আভাসিত হতে থাকে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যপট, দেশ-কাল-সমাজবাস্তবতার নানা অনুষঙ্গ। চিকিৎসা-ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থাপনা, মানুষের ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, একাকিত্ববোধের যন্ত্রণাময় আত্মপ্রকাশ, রায়ট-দেশভাগ প্রসঙ্গ ও দেশান্তরী মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রভৃতি স্বপনের স্বপ্ন-জাগরণের মধ্য দিয়ে 'অতন্দ্র' গল্পে অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন।

একটি হাসপাতালের বাস্তব করুণ চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক এ গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসা-পেশার অব্যবস্থাপনার সচিত্র প্রতিবেদন পেশ করেছেন এভাবে :

> নিচের অপরিসর স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন থেকে যার শুরু এবং গোটা একতলার সীমা ছাড়িয়ে দোতলার বারান্দায় যার শেষ, সেই নিমগাছটা থেকে এক ঝোপ অন্ধকার নিজেদের শীর্ণ কিন্তু শক্ত আঙুলগুলো বাড়িয়ে ধরেছে চারদিকে। তিন নম্বর ঘর থেকে একটা অতি ম্লান আলো নেতিয়ে পড়েছে নিমগাছটার একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ জায়গা জুড়ে। প্রচণ্ড কদর্যতায় সেই জায়গাটা আচ্ছন্ন। আর গায়ে জলবসন্তের প্রায় শুকিয়ে আসা গুটিগুলো থেকে সূক্ষ্ম ও তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে সমস্ত চেতনাই ক্লান্তিময়। ... যে-লোকটা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে, মৃত্যুর চার পাঁচ ঘণ্টা আগে সরকারি গাড়ি তাকে মহাসমারোহে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল এখানে। ... হালার এইডা হাসপাতাল না কসাইখানা— য়্যাঁ। হালার-ব্যাবকটি রাইত নার্স নাই বয় নাই। রুগিরা মরল কি বাঁচল কোনো তালাশী নাই! ... এক বিডা ফকিরের পচা লাশ রাইখ্যা দিছে হেই কহন হালার খুশবাই ছাড়ছে তো ঘরের মইদ্যেই তেষ্টন যায় না! মানুষগুলান বাঁচবো ক্যামনে, য়্যাঁ। ('অতন্দ্র', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ২৯-৩১)

স্বপনের এলেমেলো ভাবনায় জারিত হয়ে ওঠে রায়টের কথা, দেশভাগের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ মিটফোর্ড হাসপাতালের স্কিন ডিজিজ ওয়ার্ডে একজন মস্তিষ্ক বিকৃত বৃদ্ধার বাস্তবতা উপস্থাপনসূত্রে :

> নীল জামা পরে থাকা ধড়টা, লতিফ না কি যেন, বলে এ-শহরে অই মেয়েটার বিরাট বাড়ি ছিল। রায়টের সময়ে ছেলে আর স্বামীর মৃত্যু হলে পাগল হয়ে যায়। বুড়ি ঝিটা বলে এ বাড়িটাই আসলে ওর।... পুরনো ধরনে তৈরি এ বাড়িটায় সে আগে বাস করত। গেটে সাদা পাথরের ওপর সেই লোকটার নামও দেখেছে এখানে ঢোকার সময়। এস. এন. ব্যানার্জী এখন কোথায়? এস. এন. ব্যানার্জী এখন

> ইন্ডিয়ায়? এস. এন. ব্যানার্জী, বি.এল.প্লিডার, জজকোর্ট; এস. এন. ব্যানার্জী, বি.এল. প্লিডার, জজকোর্টের বৌ, ছেলে-মেয়ে কি এখন কলকাতায় থাকে? তাদের আত্মাগুলো খণ্ডিত হয়ে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে না? ওদের নিশ্বাসগুলো অতৃপ্তির পিচকারি দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়ে ঘরটাকে বরফের মতন হিম করে ফেলছে না? অথচ ওরা এখন কেউ নেই। গুষ্টিশুদ্ধ সব হিন্দুস্তান চলে গেছে। ওরা কলকাতায় গেছে। না বর্ধমান? না বহরমপুর? না বাঁকুড়া? না কাটোয়া? ('অতন্দ্র', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৩২)

দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপর্যস্ত অবস্থার করুণ চিত্র বাস্তবতার নিরিখে গল্পে প্রকট করেছেন লেখক শৈল্পিক দক্ষতায়। কেবল তাই নয়, অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপর্যস্ত চরিত্রের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ববোধ, অসহায়ত্ব ও সত্তা-বিচ্ছিন্নতাবোধের রূপায়ণ করতে গিয়ে লেখক চমৎকারভাবে হাসপাতালের জনৈক ব্রাদারের হস্তমৈথুনের প্রসঙ্গটি অবতারণা করেছেন এভাবে :

> চেয়ারে উপবিষ্ট ব্রাদারের সামনে টেবিলের ওপর সেই মার্কিন সাময়িকীর একটি পাতা যেখানে সমুদ্রের তীরে অতি পাতলা কটিবাস পরা জনৈক মার্কিন মহিলা, যার ঠোঁটে আমেরিকার একটি বিখ্যাত সিগ্রেটের অংশবিশেষ। ব্রাদারের লোলুপ দৃষ্টি সে শরীরের প্রতিটি অংশ দুর্নিবাররূপে উপভোগের আনন্দে উত্তেজিত। সেই ছবিরই প্রেরণায় ব্রাদার নিবিষ্ট মনে আত্মরতিতে লিপ্ত। 'আপনি!' মলিন যন্ত্রণায় মুখের প্রতিটি রেখা করুণ করে ব্রাদার বলল, 'আপনি – এত রাত্রিতে যে!'
>
> কেউ দেখতে পায়নি জেনে টেবিলের নিচে হাত গলিয়ে পায়জামার ফিতে লাগাতে লাগাতে বলল, 'আপনার বইটা বেশ। সময় কাটছিল ভালই।' ('অতন্দ্র', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৩৩)

সমস্ত এলোমেলো ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অবশেষে স্বপন ভাবে : "ঘুমোলেই তো সব কেটে যায়। সব কেটে যায়। জলবসন্তের শুকিয়ে আসা গুটির জ্বালা; জিভের, গলার বিস্বাদ, থুথুর অজস্র টুকরো আর এই ভয়াবহ পক্স ওয়ার্ডের সুতীব্র তীক্ষ্ণ কশাঘাত – সব থেকে মুক্তি পাব আমি ! ঘুমোলেই তো সব কেটে যায়। ঘুমের চরম ক্লান্তির অতল আনন্দে আমার কষ্টগুলো কেটে যাক" ('অতন্দ্র', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৩৩)। সমাজ সংসারের চারপাশের অরাজকতাময় পরিবেশ পরিস্থিতি, সামাজিক অব্যবস্থাজনিত হতাশা, স্বপ্ন ও বাস্তবতার যোজন দূরত্ব, জীবনকে বিষিয়ে তোলা বিপন্ন সভ্যতা, সর্বোপরি রুদ্ধশ্বাস এক সামাজিক অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বপন তাই ঘুমের অতল স্পর্শে জীবনের ক্লান্তিকে, একঘেয়েমিকে পাশ কাটিয়ে যেন বাঁচতে চেয়েছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছে। উপায়হীন হয়ে জীবন থেকে পলায়নপর প্রবৃত্তির স্বরূপকেই যেন লেখক 'অতন্দ্র' গল্পের পরতে পরতে রূপায়িত করেছেন। সমাজবাস্তবতার নিরিখে গল্পটি অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয়বাহী।

উত্তম পুরুষে লিখিত সমাজতাত্ত্বিক ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার অনবদ্য নিদর্শন 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' গল্প। দার্শনিক অভিজ্ঞান, জীবনসম্পৃক্ত এই গল্পের মধ্য দিয়ে জীবন, জগৎ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সম্পর্কিত নানা বিষয়ের অনেক নতুন কথা নতুন ভঙ্গিতে বলার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের নানা অনুষঙ্গের তাৎপর্য অনুধাবন সহজতর হয়েছে। মানুষ অপূর্ণতার মাধ্যমেই জীবনের বৈচিত্র্যের সন্ধান লাভ করে থাকে। কেননা : "পূর্ণমানুষ মৃতমানুষ। অপূর্ণতাই জীবনের আরেক নাম। একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তির দ্বারা মানুষকে, মানুষের কর্মকে অমর করে।" (মোস্তফা, ২০০৭ : ৭৯)।এ কারণেই মৃত্যু মানবজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মৃত্যুকে ঘিরে প্রত্যেকের তাই এত চিন্তাভাবনা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কোনো একটি গল্পে বা কোনো একটি গ্রন্থে একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য থাকে যা দেশ, জাতি, মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' গল্পে জীবন, সমাজ, দেশ ও জাতির সঙ্গে লেখকের শিল্প-সম্পৃক্তি অসাধারণ ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে। উত্তমপুরুষে বর্ণিত এ গল্পে লেখক নিজস্ব চিন্তাচেতনা, ক্ষোভ ও হতাশার কথা তুলে ধরেছেন। গল্পের ধারা বর্ণনায় কয়েকটি নামের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেগুলো আসলে চরিত্র হয়ে ওঠেনি। লেখকের অন্তর্নিহিত চেতনা-ই কখনও চরিত্র কখনও ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। ইলিয়াসের এই গল্পের পরিবেশ যেমন ভ্যাঁপসা, স্যাঁতস্যাঁতে, গুমোট, কখনো-বা অস্পষ্ট ধোঁয়ায় ঢাকা; তেমনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও অসুস্থ, পঙ্গু জরাগ্রস্ত, ক্লেদাক্ত, পাংশুবর্ণ। চরিত্রগুলো ভাবলেশহীন নয় ঠিকই, কিন্তু গল্পে ভাবের সেই সফেন সমুদ্রের দেখা মেলেনা, এটাই যেন তার বৈশিষ্ট্য। সময় সহযোগে যে-মানুষ এগিয়ে যায় সামনের দিকে, তার এগিয়ে চলার পথ যদি এবড়ো-থেবড়ো, অচল ও বন্ধুর হয়— তবে স্খলন তো স্বাভাবিক; ইলিয়াস গল্পে যেন সেই স্থির রূঢ় বাস্তবতাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। জীবনের বহির্দৃশ্যকে অন্তর্যাপনকালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি এ গল্পে, পক্ষপাতিত্ব ছিলো না কোনো ব্যাপারেই। কাজেই গল্পের চরিত্রগুলো নিজের গরজে যেমন এগিয়ে আসে, আবার কখনো চারপাশের দুর্দশার চাপে চলেও যায়। কেউবা টিকে যেতে পারে যুঝবার সামর্থ্যে। কিন্তু, যথার্থ বেঁচে থাকার দুঃসাহস পরিলক্ষিত হয় না কারো মধ্যে; হয়তো তাদের সময়টাই দুঃসহ বলে। দুঃসহ সময়ের বেড়াজালে আটকে থাকা জীবনের নানা অনুষঙ্গ মৃত্যুচেতনার অবয়বে এ গল্পে লেখক মূর্ত করেছেন এভাবে :

> বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে বসেও আমাদের একই পণ্যের ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অসাধুতা প্রসঙ্গে দালাল বন্ধুর একঘেয়ে আলোচনা শুনতে শুনতেও কোনো জনবহুল শহরের নোঙরা বস্তির জঘন্য ড্রেনের পাশে বসে মৃত কুকুরের পোকাধরা মাংস রেস্টুরেন্টের গেলাসের জলে খেতে বাধ্য হয়ে শববর্গের আর্তনাদ উপভোগ করি। শববর্গের প্রকট বীভৎস আর্তনাদ মানসিক বিবর্তনের অজস্র স্তর

> অতিক্রমের পর ম্লান, বিকৃত গন্ধ ও দুর্বল হয়ে আমার রক্তে অতি ক্ষীণ একটি শব্দে প্রকাশিত হয়। আমি অত্যন্ত ভীত হই। আমি ভয় পাই ; ভয়াবহ, ধূসর, বোবা এক চোখ কানা কিন্তু নিয়মিত জনৈক আতঙ্কসমগ্র আমার প্রত্যেকটি অংশকে দুর্নিবাররূপে উপভোগ করতে করতে আমার প্রচণ্ড অনিচ্ছায় আমাকে ধর্ষণ করে। আমার পুরুষ, স্বামী, জনক প্রভৃতি পরিচয় এবং চেতনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তার ধারালো নখ দিয়ে আমার বিশাল স্তন চিরে ফেলে। আমার তেত্রিশ বছরের পুরুষের ভাঙা ব্রণসঙ্কুল গাল যুবতীর মসৃণ মাংসল গাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেখানে তার মুখের যথেচ্ছ ব্যবহার। তার নোঙরা, লবণাক্ত নিশ্বাস আমার অনুভূতির অবিচ্ছিন্নতা লাভ করতে সক্ষম হয়। ('স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৪৬)

এ গল্পে সময়, সমাজের বিচিত্র ক্যানভাসকে চরিত্রের অনুষঙ্গে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে লেখক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন দীর্ঘ বাক্যগঠনে। তবে লক্ষণীয় : "এই দীর্ঘ বাক্যপাঠে অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে তার গদ্য বিরক্তিকর হলেও সজ্ঞান হৃদয়সংবাদী পাঠক গল্পের ভেতরে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হন না" (সুশান্ত, ১৯৯৭ : ১১৮)। গল্পটি তাই দীর্ঘবাক্য পাঠের ক্ষেত্রে ওজনে ভারি এবং একই সঙ্গে সহজবোধ্য না হয়েও কেমন যেন অনায়াস চলনে পাঠ-রম্য হয়ে ওঠে। দীর্ঘবাক্য এবং সরল গদ্যের যৌথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গল্পটিতে আঙ্গিকগত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় স্পষ্ট। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই গল্পের মধ্যে সমাজসচেতন জীবনের সন্ধানে ব্যাপৃত লেখকের উপস্থিতি লক্ষণীয় :

> গরু খুঁজতে খুঁজতে এদ্দূর এসে গরুও নেই, পথও নেই। গরু নেই কিন্তু গরুর দুধ জোগাড় নাকি হবেই। প্রান্তরের কোথাও সবুজ নেই, তাতে কী? প্যাক হয়ে টিন টিন পাউডার দুধ তো আসছেই, চিন্তা নেই। বহুবার উল্লিখিত বিষণ্নতার বৃত্ত হলো সেই আলো যেখান থেকে দুঃখের উৎস অর্থাৎ যেখান থেকে দুঃখিত হবার প্রেরণা প্রচারিত হয়ে থাকে। ('স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৪০)

এছাড়াও গল্পের মধ্যে লেখকের দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে অবলীলায়। গল্পে বিবৃত করেকটি উদাহরণ লেখকের দার্শনিক ভাবনার গভীরতাকে প্রকাশ করতে যথেষ্ট। যেমন :

ক. মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষ গোণে! কবিতায় সন্ধ্যার পাখি গোণে; কিন্তু নিশ্বাস গোণে না। ('স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৩৮)

খ. বিশ্রামের ক্লান্তিতে নিম্নতম মর্যাদা দিয়ে সময়ের যে স্থূল অবয়ব প্রকাশিত হয় তাকেই কি মানবিক মূল্যবোধ বলে যার লৌকিক প্রতিশব্দ স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা – বলাটাকে সুসম্পূর্ণ করতে গেলে – ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি? ('স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৩৮)

গ. তুমি তোমার শিক্ষা, কালচার, মাজিত বুদ্ধি ও সর্বোপরি এনালিসিস দিয়ে চারদিকের সঙ্কীর্ণতা, হীনম্মন্যতা ও আনন্দকে নিম্নতম গুরুত্ব দাও, তা হলেই রজনীগন্ধার নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে শববর্গ নীরব বিদ্রোহ করতে ব্যর্থ হবে। ('স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৪৬)

সমাজ-রাষ্ট্র-জীবন সম্পর্কিত ভাবনা ও দার্শনিক চেতনার সমন্বয়ে গল্পটি যেন লেখকের শৈল্পিক দক্ষতাকেই ধারণ করেছে যথার্থভাবে।

'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' গল্পের কাহিনি মৃত্যুচিন্তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। গোরস্তান এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণতি পেয়েছে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, লৌকিকতা থেকে অলৌকিকতা পর্যন্ত কাহিনি ব্যাপ্ত হয়েছে গল্পটিতে। এই গল্পে তথাকথিত কাহিনিকে আশ্রয় না করে স্বগতোক্তি বা আত্মকথনের আকারে চরিত্রটি বলে গেছে তার একান্ত-ভাবনার কথা। এই একান্ত-ভাবনার মধ্য দিয়ে পরিব্যাপ্ত ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালেই লেখকের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক অবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায় গল্পে। গল্প লেখার শুরু থেকেই যে মৃত্যুচিন্তা ইলিয়াসকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' গল্প, যা লেখকের মেজো আপার মৃত্যদৃশ্য নির্মাণে অনবদ্য শিল্পফসল :

> মেজো আপা অনেকবার আমাকে বারণ করেছে গোরস্তানে যেতে, কতবার। আমি একবারও মানিনি। এ নিয়ে কোনোদিন রাগ করেনি আমার মেজো আপাটা, আহা! কেবল বারবার বারণ করা আর আমাকে শুধু মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে যে অলৌকিকতায় ঘেরা, প্রখর বেদনায় অঙ্কিত কোনো দীর্ঘ জটিল কাহিনী আমার অস্তিত্ব। বিশাল, চারদিকে আকাশের মতো মজবুত করে প্যাক করা কফিনের মধ্যে আমি এক হারানো আত্মা। সমুদ্রে মাছের মতো কাহিনীতে ডুবে থাকি আমি। এই অনুভব ম্যাচুর্ড হতে থাকে, হাত পা শরীরের মতোই। মেজো আপার করুণ আত্মহত্যা সমুদ্রের লবণাক্ততাকে অতিক্রম করে প্রখর করে তোলে আমার রক্তের প্রবাহ। আমরা তিনজন বন্ধুই এই লবণাক্ত কাহিনীকে স্বাদি। দিন দিন আরো বেশি করে আমাদের মুখ চোখ ঘষা গোরস্তানের নিরাকার মাংসে। ... মেজো আপার আত্মহত্যা আমাদের সম্পদ। এই সম্পদ মৃত্যুকে ডেকে নেবার অভিশপ্ত সাধ, মৃত্যু, ঈশ্বর সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, পরলোকের ওপর নতুন নতুন কথা তৈরি করতে সাহায্য করে। মেজো আপার আত্মা নিজেকে সহ্য করতে পারল না। মেজো আপা, নিজের আত্মাকে সহ্য করল না, করল না। সবাই কি হারিয়ে যায়? ('নিশ্বাসে যে প্রবাদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৪৯-৫০)

সমগ্র গল্পটি যেন এক বিশেষ স্বপ্নঘোর বাস্তবতায় লিখিত। গল্পের একটি অংশ উল্লেখযোগ্য :

> এই গল্প, বারবার শোনা অথচ অস্পষ্ট, অপরিচিত জীবনের এই অলৌকিক কাহিনী শোনাতে আমার য়্যাতো ভালো লাগে। গল্প বলতে বলতে আবেগ আর আতঙ্ক

> য়্যামোনভাবে জড়িয়ে ধরে আমাকে। য়্যামোনভাবে, ইস্! হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাই, রুদ্ধ হয়ে যাই আমি। আর বলতে পারি না, আর না। প্রত্যেকটি শব্দ আমার সত্যতম, হৃদয়তম, আতঙ্ক, আনন্দ, বিষণ্নতা আর অতৃপ্তি দিয়ে প্রবলভাবে অঙ্কিত। গভীরভাবে তখন একটি ঢেউয়েই ডুব দিই আমরা, একটি মাত্র স্রোতে। তখন আমরা একটি জলস্তম্ভের মতো সজল, শূন্যতাহীন; অতিভরা একটি ডিমের মতোন। সূর্যের ছাড়া ছাড়া শুকনো রোদ, চাঁদের ছোপ ছোপ গলানো আলো— কিছু নয়, কিচ্ছু না, কেবল মেঘরাত্রির গভীর জলে অন্ধকার মিউজিক আমাদের, উপমা নয়, একমাত্র পরিচয়। ('নিশ্বাসে যে প্রবাদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৪৮-৪৯)

'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' গল্পে শব্দ এবং বাক্যবিন্যাসে কাব্যদ্যুতির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের বাক্যবিন্যাস গদ্যে লেখা কাব্য, না কাব্যে লেখা গদ্য – এরকম একটি দ্বন্দ্ব তৈরি করে দেয় পাঠকের চেতনায়। মনে হতে থাকে গদ্য বিন্যাস যেন লেখকের একান্তই ভাববিহ্বলতায় লেখা। 'প্রবাদের প্রাত্যহিক মিথুন', 'গোরস্তানের নিরাকার মাংস', 'কেবলি অস্থির, আমরা অস্থির, আমরা' কিংবা 'কথা দেখি রোজ', 'কাহিনী থেকে নির্জন', 'লোকটাকে তাকালুম' – এই বাক্যগুলো প্রচলিত গদ্যের চেহারায় লেখা নয় এবং এই বাক্যবন্ধে লিখিত ভাবনাগুলো যেন স্বগত উক্তির প্রতিলিপি। গোরস্তানকে কেন্দ্র করে লেখা এই গল্পে সর্বোপরি মৃত্যুচেতনার মধ্য দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্র বা মেলবন্ধনটিকেই লেখক ভাবনার নানামাত্রিক অনুষঙ্গের আধারে মূর্ত করে তুলেছেন। মৃত্যু মানেই শেষ কথা নয় বরং জীবনের বহুমুখী ঘটনার সমান্তরাল প্রবাহকেই যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায়। গোরস্তানের মধ্যে বিরাজমান মৃত্যুর নীরবতার মধ্য দিয়ে অবিরাম যেন জীবনেরই নানা অনুষঙ্গের আবর্তন ঘটে চলেছে – এরকম একটি বিবেচনা লেখকের স্বগত ভাবনায় জারিত হয়ে উন্মোচিত হয়েছে পুরো গল্পজুড়ে। সে কারণেই :

> গোরস্তানের সেইসব লুপ্ত নিশ্বাসদের সঙ্গে ক্লান্ত হবার কী ইচ্ছা আমাদের। কিন্তু হায়, আমাদের জানা আছে, রক্তের সঙ্গীতে লেখা আছে, তোমরা এ কাহিনী থেকে কোনোদিন নির্জন নও। আমাদের অবচেতনে আমরা প্রবেশ করেছি এ কাহিনীতে, কেউ জানে না – হায়! স্বাভাবিক নিয়মের নিয়মে আমাদের ঢোকানো হয়েছে – আমরা কেন জানি না হায়! এক জটিল, ঝাপসা আমাদের বহুকালের বাস এখানে। আমাদের যে অংশ কাহিনীতে নির্মাণ করেছি আমরাই, তারও কত আগে থেকে সেই সব ঝাপসা চেতনাদের আশ্রয়। ('নিশ্বাসে যে প্রবাদ', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৫০)

পুরনো ঢাকার জোড়পুল লেনের বেঢপ এক বাড়ির চিলেকোঠায় হাসানের বসবাস। এলিফ্যান্ট রোড হতে বাসে চড়ে গুলিস্তান; তারপর নবাবপুর হয়ে জোড়পুল লেন। একদিন বাসে লেডিস সিটে এক মহিলা যাত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়া – যিনি হাইকোর্টে নেমে গিয়েছিলেন। স্বপ্নাতুর হাসান তাকে ঘিরে কল্পলোকে নানা স্বপ্নের জাল বোনে। পরদিন ঐ একই সিটে বসা অল্প বয়সী একজন ছেলেকে ঘিরে

হাসানকে একই ধরনের কল্পনা করতে দেখা যায়। এমনকি বাসের জন্য অপেক্ষারতহাসান রাস্তার পাশে পঙ্গু ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষার আশায় বসে থাকা ভিখারিনিকেও তার কল্পনায় একীভূত করে অবলীলায়। সে কল্পনায় কেবল প্রেমভাবনাই নয় বরং যৌনাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা মিশে থাকে। অবিবাহিত যুবার যৌনাকাঙ্ক্ষার বর্ণনার আড়ালে সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরস্থ অব্যবস্থাপনা, সামাজিক অস্থিরতা এবং ব্যক্তিচরিত্রের নিঃসঙ্গতার এক বাস্তবসম্মত শিল্পরূপ 'চিলেকোঠায়' গল্পটি। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, রাজনৈতিক দ্বিচারিতা, ব্যক্তিমানসের অস্তিত্বের সঙ্কটকে রূপায়িত করার পাশাপাশি এ গল্পে পুরনো ঢাকার জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড দৃশ্যরূপ মূর্ত হয়েছে। 'চিলেকোঠায়' গল্পে নারী-পুরুষ নয়, কামনার বিকৃতি ছড়ায় দুটি পুরুষের মধ্যে, কখনো-বা ভাবনালোকে ব্যক্তি শারীরিক আনন্দ খোঁজে। অবিবাহিত যুবার যৌনাকাঙ্ক্ষার বর্ণনা লেখক এ গল্পে নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা ঘৃণার অথচ একইসঙ্গে বাস্তব ও নির্মম সত্য। বাসের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরযখন বাস আসে,বিরক্ত হাসান তাতে উঠে পড়লে সেই বিরক্তির প্রায় পুরোটাই উবে যায় লেডিস সিটে বসা জনৈক তরুণীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে। হাইকোর্টের সামনে এসে মেয়েটা বাস থেকে নেমে পড়লেও হাসানের কল্পনায় বিরাজমান থাকে সে। বাড়ি ফিরেও সে ঐ মেয়েকে নিয়ে ভাবনার অতলে ডুবে থাকে। হাসানের ভাবনায় মেয়েটি জারিত হয় এভাবে :

> অস্থির হয়ে হাসান বিছানার ওপর সোজা শুয়ে পড়ে। মেয়েটাকে ভাবতে ভাবতে বোতাম খুলে হাঁটু ভাঁজ করে প্যান্টটা বার করে নেয় পা থেকে। ভেতরে আন্ডারওয়্যার স্যাঁতসেঁতে। ... শুয়ে শুয়েই আন্ডারওয়্যার খুলতে গিয়ে দেখে, ঘাম ও ময়লায় হাতের আঙুল চটচট করছে। নাকের কাছে আঙুল ধরে গভীরভাবে গন্ধ নিলে একটু খারাপ লাগে, ভালোও লাগে।
>
> মেয়েটার মুখ কি তাড়াতাড়ি ঝাপসা হয়ে আসে। ওকে আমি কিছুতেই এই ঘর থেকে হারিয়ে যেতে দেবনা, ওকে হারালে চলবে না। প্রবল বাসনাকে বাম হাতে আঁকড়ে নিয়ে হাসান ওর শীশ্নশীর্ষে সেই হাত চেপে ধরল পরম আদরের সঙ্গে। ('চিলেকোঠায়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৫৮)

মগ্নচৈতন্যে মেয়েটিকে নিয়ে হাসান প্রেম-ভাবনার বিচিত্র জাল বুনতে থাকে। স্বপ্নে নাম না জানা মেয়েটিকে সে 'সোফিয়া' নামে ভাবতে ভালোবাসে। কল্পনাতেই মেয়েটিকে কেউ একজন 'সুফিয়া' নামে ডাকতে থাকলে হাসান অস্বস্তিতে ভোগে। কেননা : "কল্পনাতেও কারো ইচ্ছেমতো নামকরণ করতে পারে না বলে ফ্যাকাসে ধরনের ব্যর্থতাবোধে কষ্ট পায়" ('চিলেকোঠায়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৫৯)। বাস্তবজীবনেও যেমন, তেমনি কল্পনাতেও হাসান বা হাসানের মতো মধ্যবিত্ত টানাপড়েনের বেড়াজালে, অস্তিত্বের সঙ্কটে-সংঘর্ষে ক্রমাগত ব্যর্থতাবোধে ক্লান্ত হতে থাকে। প্রেম-ভালোবাসা তাদের কাছে যেন বিলাসিতা স্বরূপ। যদিও যৌন-সাধ

মেটাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অতি সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি, তবুও হাসানের মতো মানুষেরা জীবনের এই স্বাভাবিক বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গতাকেই আশ্রয় করে নেয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন : "মানুষ কেবল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে – কেউ তার দিকে হাত বাড়ায় না" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ২৮১)।এই বিচ্ছিন্নতার সংকটকে লেখক দেখেছেন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-ব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি স্তরে। স্বাভাবিকভাবেই তাই একটি নারীর স্বাভাবিক আসঙ্গ কামনায় মশগুল যে হাসান তাকে তৃপ্ত হওয়ার জন্য আশ্রয় নিতে হয় আরেকটি পুরুষের আশ্লেষে :

> ছেলেটা বিছানায় বসে প্রথমে হাসানের কোমরে, পরে আস্তে নিচে হাত বুলোতে লাগল। সেই সরু আঙুলগুলো থেকে কী ভয়ানক রক্ত প্রবাহিত হয়। হাসান দেখে, হঠাৎ সে ছেলেটার নোনতা গালে প্রবলভাবে চুমু খেতে শুরু করেছে। ছেলেটা তখন হাসানের জন্যে নিজের প্যান্ট খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। ... মধ্যরাতে বাইরে বিপুল জ্যোৎস্না, অনন্ত আকাশে প্লাবন বয়ে যায়, আর চিলেকোঠায় ফ্যাকাশে অন্ধকারে চরম সুখের সাধে হাসান তাকে নিবিড় করে কাছে টানে।('চিলেকোঠায়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৬১)

কেবল তাই নয়, হাসানের যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিম-লে রাস্তার পাশের ভিখারিনিও জায়গা করে নেয় অবলীলায়: "একটা ভিখারিনি পঙ্গু ছেলেকে নিয়ে বসে আছে রাস্তার উল্টোদিকে ফুটপাথের নিচে। মেয়েটার শরীর টরির মন্দ নয়। আঙুলগুলো সরু ও ময়লা। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, একটা টাকা দিলেই মেয়েটা ওর সঙ্গে সোজা এই চিলেকোঠায় চলে আসবে।" ('চিলেকোঠায়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৬০) হাসানের এই সব স্বপ্ন-কল্পনা জাগরণের দোলায় আবর্তিত ভাবনার মধ্য দিয়ে গল্পে পুরনো ঢাকার জীবনযাত্রার প্রচ্ছাপ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে :

> জোড়পুল লেন থেকে যখন চাপা উপগলিটায় ঢুকবে তখন সে ভুলেই গেল যে এখানে নিশ্বাস বন্ধ করা দরকার – ডাস্টবিনে, রাস্তায় জ্যোৎস্না ও ময়লা উপচে পড়ছে। মরা বিড়ালের গন্ধ হঠাৎ নাক, গলা ও বুকের মধ্যে স্বাদ ছড়িয়ে পেটের মধ্যে সেঁধে যায়। স্যান্ডেলের ফাঁক দিয়ে নালার পাশের তরল ময়লার একটু খানি পায়ের আঙুলের ফাঁকে কিলবিল করে। হঠাৎ ভয় করে, এই ময়লা কি কারো পরিত্যক্ত কৃমি? ... ঘোরতর অন্ধকার সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় দোতলায় বাড়িওলার ঘ্যানঘ্যানে বৌটার কাকে যেন 'খানকির বেটি' বলে বকাবকি, তিনতলায় রেডিপাকিস্তানের গান। ('চিলেকোঠায়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৫৭)

এহেন ক্লেদাক্ত জীবন ও পরিবেশে হাসানের স্বপ্নের সীমানা তার আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। জীবন যেখানে কোনোরকমে বয়ে নিয়ে যাওয়া বা টেনে টেনে পার করার আপ্রাণ চেষ্টায় অতিবাহিত হয়, জীবনের ছন্দপতন সেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে। সামাজিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় প্রকাশ করতে গিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ব্যক্তিমানুষের যৌনজীবনের স্খলনকেই বাস্তবতার আলোকে

এই গল্পের শিল্প-উপাদান হিসেবে নির্বাচন করেছেন। বাইরের এবং ভেতরের ক্রমাগত চাপে বিপর্যস্ত ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধকে, উপায়হীনতাকে অবদমিত যৌনবাসনার বিচিত্র মোড়কে হাসান চরিত্রের আবরণে প্রতিবিম্বিত করার মধ্য দিয়ে গল্পটিকে লেখক যেন সময়-সমাজ- প্রতিবেশের ক্লেদাক্ত অস্থিরতার এক অনবদ্য দলিলরূপে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন অসাধারণ শিল্প কুশলতায়। 'চিলেকোঠায়' গল্পটিকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস রচনার পূর্বপ্রস্তুতি বা ভিত্তিস্থল বলা যেতে পারে। স্থান, কাল, পাত্র পরিবর্তিত হয়ে অথবা অপরিবর্তিত থেকে যেন বৃহৎ ক্যানভাসে নির্মিত হয়েছে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস। কিন্তু এর মৌল উপাদান, মূল প্রাণবীজ এই গল্পের অন্তরেই নিহিত এ কথা বলা যায়।

অর্থনৈতিক অসাম্য ও শ্রেণিবৈষম্যের পরিমণ্ডলে সামাজিক-দৈশিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ব্যক্তিচরিত্রের মুক্তি, অস্তিত্বের সংকট,বঞ্চিত মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সংকল্প এবং বিত্তহীন শ্রেণির সংঘবদ্ধতার ইঙ্গিত 'পরিচয়' গল্পের মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে। একথা ঠিক যে, সমাজপরিসরে শোষক ও শোষিত শ্রেণি পূর্বেও ছিলো, এখনও আছে। হয়তো শোষণের কায়দা বা ধরনে পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ভাগ্যাহত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ইতিহাস একই গতিতে আবর্তিত। বিশ্বব্যাপী চলছে শোষণের মহড়া। নীলকরদের অত্যাচার রহিত হলেও গ্রামীণ কৃষকসম্প্রদায় মুক্তি পায়নি শোষণ থেকে। ইংরেজ নীলকর প্রভুরা আজ নেই, কিন্তু আছে দেশীয় শোষকের দল; আছে মহাজন, ফড়িয়া, দালাল, উঠতি ও নব্য-বুর্জোয়া শ্রেণি। এরা পেটের ক্ষুধায় কাতর ও জীবিকার সন্ধানে শহরে উঠে আসা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চালায় অবর্ণনীয় শারীরিক, মানসিক, আর্থিক নির্যাতন—তারই উল্লেখযোগ্য শিল্পরূপ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'পরিচয়' গল্প। গল্পে জুম্মন নামের এক অসহায় বালকের করুণ জীবনকাহিনি দেশ কাল ও সমাজবাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতায় উন্মোচিত হয়েছে। ফকিরচাঁদ মহাজনের আশ্রয়ে থাকে জুম্মন আলী। পথে মাঠে বহু ঘুরে নানা জায়গায় বহুজনের আশ্রয়ে ভাসতে ভাসতে জুম্মন আলীর ঠাঁই হয় অবশেষে ফকিরচাঁদ মহাজনের কাছে। স্রোতের শ্যাওলার মতোই জুম্মন আলীর জীবনযাপন। জুম্মন আলীর পরিচয় গল্পে উঠে এসেছে এভাবে :

> তার বাপ-মার বালাই নেই। খুব ছোটোবেলায় মা হয়তো একটা ছিল, কিন্তু সেকথা তার একটুও মনে নেই। কেবল কয়েক বছর আগে পর্যন্ত হঠাৎ ভয় পেলে কি খুব খিদে পেলে সারি সারি বিছানাওলা একটা ঘরের বারান্দায় দাঁড়াতে ইচ্ছে করত। ... পরে বড়ো হয়ে মনে হয়েছে ঐ মেয়েটা বোধহয় হাসপাতালের নার্স ছিল, কিন্তু তার চেহারা একেবারেই মনে নেই। তারপর তার বসবাস শুরু হয় মেডিকেল কলেজের মেয়েদের হোস্টেল কি নার্সদের হোস্টেলে সিঁড়ির নিচে। ... এরপর ফরিদাবাদে এক ডাক্তারের বাড়িতে কয়েকটা বছর। ... কিন্তু ওরা তাড়াবার আগে জুম্মন নিজেই

বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে সোজা এই লোহার পুল। ('পরিচয়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৭০-৭১)

লোহারপুল থেকে অবশেষে জুম্মন আলীর আশ্রয় জোটে ফকিরচাঁদ মহাজনের কাছে। নেশাখোর মহাজনের মদ আনতে গিয়ে জুম্মন আলী ফেঁসে যায়, অবশেষে থানা হাজতে। খবর পেয়ে মহাজন জুম্মনকে ছাড়িয়ে নিতে আসে। দারোগা জুম্মনের বাবার নাম জানতে চাইলে মহাজন জানায় :

'বাপ নাই, বাপের নাম ক্যামনে কয়?'

'মারা গেছে? নাম কী ছিল?'

মহাজন তার পুরো কালো ঠোঁটের একটুখানি জায়গা জুড়ে হাসে, 'মরে নাই সার। বাপ আছিলো না কোনোদিন।' 'অরফ্যান?'

'বোঝেন তো সার।' মহাজন তার বাঁকানো হাসি আর সরায় না, 'অর মায়ে সার ফকিরনি উকিরনি আছিলো। কতো জায়গায় আকাম কুকাম করছে, হাসপাতালে গিয়া পোলারে খালাস করাইয়া ভাইগা গেছে। এক নার্স কিছুদিন দেখছে, গেন্ডারিয়ার সুলতান ডাক্তারে কয়দিন রাইখা পরে খেদাইয়া দিছে। লোহার পুলের নিচে পইড়া আছিলো, আমি থাকতে দিছি!'

দারোগা হাসে, 'প্রবলেম হলো। আপনার নাম লিখে দিই?'

'আরে না সার,' মহাজন হাসতে হাসতে বলে, 'জাউরার ফাদার হইতে চাই না সার।'

দারোগা বলে, 'তাহলে গার্জেন হিসেবে আপনার নাম লিখি?'

'না সার। বাস্টার্ড ল্যাখেন। জাউরা ইজ জাউরা সার।' ('পরিচয়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৭৭)

এই বিবরণে কেবল জুম্মনের পরিচয়টিই বিবৃত হয় না বরং মহাজন চরিত্রের কপটতা, সামাজিক অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্বের সংকটও প্রকাশ পেয়ে যায় অবলীলায়। মহাজন জুম্মন আলীর মতো জারজ সন্তানের অভিভাবকত্ব নিতে অস্বীকার করলেও এই জুম্মন আলীই মধ্যরাতে তার বিকৃত যৌন-বাসনার খোরাক জোগায়। জুম্মন আলী ছাড়া মহাজনের রাতের ক্লান্তি প্রশমিত হয় না। কেননা :

মহাজন জুম্মনকেও দুবেলা ভাত দিচ্ছে। অনেক রাত্রে হঠাৎ মুড ভালো হলে জুম্মনকে এক গ্লাস দুধ খেতে দেয়, দুধের পর এলাচি দেওয়া মিষ্টি পান। ... নেশা ভালো করে জমলে তার সারা শরীর মালিশ করতে হয়। ... রাত্রিবেলা ফকিরচাঁদ তাকে বিরক্ত করে ঠিকই, কিন্তু ভয় পেলে কি অজানা কোনো কারণে ফাপর ঠেকলে মহাজনের বাত্রমার্কা বুকে একবার মুখ গুঁজে দিলে তার ঘুম এসে যায়। ('পরিচয়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৭৫)

মহাজন চরিত্রের বিকৃত, কদর্য ও স্বার্থপরতার মুখোশটি পুরোটাই উন্মোচিত হয়ে পড়ে মহাজনের গ্যারেজের নাজিম পাগলা রিকশাওয়ালার বয়ানের মধ্য দিয়ে। নাজিম পাগলা বছরের অল্প কিছু সময় যখন পাগল থাকে তখন মহাজনই তার স্ত্রীর দেখা শোনা করে, খরচ চালায়। এক্ষেত্রেও মহাজনের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টি বিধৃত হয়েছে এভাবে : "মহাজনে হালায় খানকিটারে কি ফুসলাইছে, কয়দিন থাইকা জিদ ধরছে, কী? প্যাটের পোলারে নষ্ট করতে হইব। বুঝলি না? আউজকা কয়, পোলার লাইগা এত দরদ, কার পোলা তুমি জান? পোলার বাপ ক্যাঠা? চিনো?" ('পরিচয়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৮০)। মহাজনদের কাছে জিম্মি, হতদরিদ্র, বঞ্চিত, অসহায় নিম্নবর্গের মানুষের উপায়হীনতাও গল্পটিতে স্পষ্ট করেছেন লেখক :

> গ্যারেজে এসে শোনা গেল পেছনের বস্তিতে পাগলা নাজিম চিৎকার করতে করতে তার পাগলা বৌকে ধরে পেটাচ্ছে। ... কী হলো? নাজিমের বৌ সখিনার চিৎকার আর থামে না। পাড়া মাৎ করে সবাইকে সে জানিয়ে দিচ্ছে যে নাজিম ইচ্ছে করেই রিকশার চেসিস ভেঙে ফেলেছে। মহাজনের বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে, মহাজনের রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আর সেই মহাজনের সঙ্গে বেঈমানি? ('পরিচয়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৭৯)

সখিনার দুমুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার সংগ্রামে নিজের সম্ভ্রম বিলিয়ে দেয়ার উপায়হীনতা বাংলাদেশের অগণিত নারীর অসহায়ত্বের প্রতিনিধিত্ব করছে। কেবল বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগের বিনিময়ে বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় এখনও বহু নারীকে তার সম্ভ্রমকেই বিনিময়মূল্য হিসেবে বেছে নিতে হয়। সখিনার এই মর্মন্তুদ জীবনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তথাকথিত অবস্থাসম্পন্ন বিত্তবান শ্রেণির শোষণের চিত্রটি প্রকটিত হয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, যৌন-চেতনা ও মৃত্যুচিন্তা— জীবনের সবচেয়ে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ এই চাহিদাগুলোই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই গল্পের মৌল উপাদান। এসব মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম সংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকায়, মানবেতর জীবনের ভয়াবহ গ্লানির মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক প্রবহমানতার বিরুদ্ধ-স্রোতে ভাসতে থাকা এসব নিরন্ন মানুষেরা একসময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার মতো অবস্থা হলে সংক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এই গল্পেও তাই দেখা যায়, জুম্মন আর নাজিম পাগলা দুজনেই মহাজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গল্পের শেষাংশে দেখা যায় জুম্মন লোহার পুলের উপরে উঁচুতে উঠে মহাজনকে খুঁজতে ব্যস্ত, আর ওদিকে নাজিম পাগলা ঠিক তার নিচে অর্থাৎ লোহার পুলের মাঝখানে। নাজিম পাগলার জন্য রাস্তায় জ্যাম লেগে যায়। মানবেতর জীবনযাপনকারী নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রতিরোধের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে গল্পে চমৎকার একটি ভাবকল্প তৈরি করে ইলিয়াস যেন ব্যক্তি মানুষের মুক্তির বিষয়টিকেই উন্মোচন করেছেন এভাবে :

এবার নাজিমের মেজাজ বেশ চড়ে গেল, 'মহাজনের মারে বাপ! মহাজনে আইবো, তর কী? এই পুলের উপরে খাড়াইয়া মহাজনরে দিয়া মারাইবি? চুতমারানি, রাস্তা জাম হইয়া যাইবো না? টেরাফিকে ধরবো না তোমারে?'

কিন্তু জুম্মন কেবল সামনের দিকে দেখছে। এই রাস্তা এসেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে, অবিরাম গাড়ি আসছে, এই এত ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি, স্কুটার, রিকসার ভিতর দিয়ে মহাজন আবার কেটে না পড়ে!, সে সামনের দিকে সতর্কভাবে দেখতে দেখতে নাজিমকে বলে, 'মহাজনে আইবো! এই ইটাটা না ফালাইয়া হালায় মাথাটা ছেঁইচা দিমু।'

'কেল্লায়?' নাজিম সোজা তার নিচে এসে জিজ্ঞেস করে।

'চুতমারানির বাপের নামটা ভুলাইয়া ছাড়ুম।'

নাজিম দাঁড়িয়েছে তার নিচে, পুলের মাঝখানে। তার জন্য রাস্তার দুদিক থেকে আসা ট্রাক, স্কুটার সব থেমে পড়েছে, তাদের হর্ন ও তাদের ড্রাইভার, কন্ডাক্টরদের সম্মিলিত এলোমেলো গালা-গালির হই চই হচ্ছে বলে খুব চেঁচিয়ে জুম্মনকে জিজ্ঞেস করে, 'পারবি?'

'পারুম না?' ('পরিচয়', *রচনাসমগ্র-৪*, ২০০৭ : ৮২)

জুম্মন আলীর জবাবের এহেন দৃঢ়তার মধ্যে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনও সরব ঘোষণা নেই যদিও, কিন্তু পাঠক এক নিমেষেই জুম্মন আলীর বাসনার কথা বুঝে নিতে পারে সহজেই। আর ঠিক ওইখানটাতেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্বাতন্ত্র্য। এভাবেই সমাজ-বাস্তবতার দুঃসহ সময়ের এক অনবদ্য দালিলিক প্রমাণে অভিষিক্ত হয়ে পড়ে 'পরিচয়' গল্পটি।

সার্বিক আলোচনায় বলা যেতে পারে যে, অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছোটগল্পের নানামাত্রিক অনুষঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পরিণত ছোটগাল্পিক সত্তার উদ্ভাসন লক্ষণীয়। কেবলমাত্র সজ্ঞান পাঠক ব্যতীত তাঁর গল্পপাঠ আনন্দদায়ক নয়, কেননা :

> আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প পাঠককে তীব্র অস্বস্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। পাঠকের ভেতরে লাগাতার ধস্ নামে। বাস্তব নিয়ে গাল-গল্প, কি শাঁস খাওয়ার নামে বাস্তবের গা থেকে খোসা ছাড়ানোর বুলি কপচানো ভালো লাগলেও বাস্তবের খানা-খন্দ, কি পুঁজ-ঘা-এর মধ্যে একবার নিজেকে আবিষ্কার করে ফেললে বাস্তবকে তখন এড়িয়ে যেতে চায় মানুষ। বাস্তব হয়ে ওঠে অসহ্য। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ওই বাস্তবের রূঢ়, রুক্ষ, দমচাপা অংশ, যেখানে জীবন নিয়ে ফূর্তি নেই, বিষাদ ও বিষণ্নতা দিয়ে ভরপুর। কোন গল্পে জীবন নিয়ে মজাকি বা ইয়ারকির সুযোগ এলো তো সেখানে তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করে পাঠকের করোটি ধরে চোয়াল ধরে চাপ দিয়ে লেখক বুঝিয়ে দেন— তাঁর গল্প মজার জন্য নয়।(সুশান্ত, ১৩৯৯ : ৭৭)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রকরণ-পরিচর্যায় নিরীক্ষাপ্রিয় লেখক। ছোটগল্পের পটভূমিতে "অ্যান্টি-রোমান্টিক দৃষ্টিকোণে প্রাত্যহিক ভাষায় তিনি নির্মাণ করেন

যাপিত জীবনের চালচিত্র। পুরোনো ঢাকার ভাষা, কুট্টিদের খিস্তি খেউড়, আর বাখরখানি-সংস্কৃতি ইলিয়াসের গল্পে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত যেন। ... ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনী-বয়ন ইলিয়াসের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য" (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১৮৮)। সমাজবাস্তবতার একজন অন্যতম রূপকার হিসেবে দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় পূর্বের এবং তাঁর সমকালের কোনো কোনো লেখকের সঙ্গে ঐক্য থাকলেও গল্পভুবনে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষণীয়। গল্পের মধ্যে একক ব্যক্তির মাধ্যমেই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্বের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। অতএব আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পবিশ্ব মূলত ব্যক্তিবাদের গল্পবিশ্ব; লেখক সেখানে সম্পূর্ণই নৈর্ব্যক্তিক। যার অন্তরীক্ষে লুকিয়ে আছে সমাজ বা সময়ের পট ও পটভূমি। যে জীবন একজন মানুষকে, সে নারী কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন, অসুস্থ-অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে, সে জীবনে খননকার্য চালিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত প্রেক্ষণভূমি থেকে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে। সমসাময়িক সময়, দ্রোহ-বিক্ষোভ, সমাজের বিচিত্র দ্বান্দ্বিক পরিসরই তাঁর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের অবয়বে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিকে "যুগপৎ তার সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে দেখা ইলিয়াসের স্বভাব" (জাফর, ২০০১ : ৫০)। ফলে স্বাভাবিক প্রবণতায়ই ছোটগল্পে রূপায়িত চরিত্ররা বিশেষ কোনো ভালো বা বিশেষ কোনো মন্দের প্রতিভূ হয়ে উপস্থাপিত হয়নি, উপস্থিত হয়েছে সমগ্রতা নিয়ে। জীবনের নানামাত্রিক বাস্তবতার উন্মোচন ঘটাতে গিয়ে প্রকারান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে :

> স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ, সামরিক শাসন, শ্রেণিশোষণ, ব্যক্তিমানুষ সংকটে উঠে আসে। ভূমি-মাটি-অনুবর্তী প্রান্তিক মানুষ চিত্রিত হয় শক্তিশালী প্রকরণে। বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীল রূপ তাঁর মধ্যবিত্ত বা বিত্তবান চরিত্রের মাঝে তটস্থ বা বিস্রস্ত থাকে। অপবিকশিত মধ্যবিত্তের অন্তর্যন্ত্রণা রাষ্ট্রকাঠামোর অপহারী পরিবৃত্তে বন্দি। গল্পচরিত্ররা সে কাঠামোতেই ভাষা পায়। সেখানেই জীবনের যাবতীয় সংক্ষুব্ধতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। (শহীদ, ২০০৯ : ২৯২)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অগ্রন্থিত ছোটগল্পের নানামাত্রিক পটভূমে বিন্যস্ত জীবনের বহুমুখী অভিক্ষেপেও সেই সংক্ষুব্ধতার প্রকাশ লক্ষণীয়। অগ্রন্থিত গল্পগুলো তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই অসহ সময়-প্রতিবেশ ও সমকালের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বাস্তবতার জীবনঘনিষ্ঠ উন্মোচন-সূত্রেই বিবেচনাযোগ্য।

সহায়কপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৮)। 'আমার প্রথম বই'। *তৃণমূল* [সম্পা.আনু মুহাম্মদ] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা। পৃ. ২৮১

আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আলাউদ্দিন মণ্ডল (২০০৯)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: নির্মাণে-বিনির্মাণে*। মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৭)। *সাম্যবাদী*। আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস [সম্পা.] (২০০৭)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-৪*। মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

জাফর আহমদ রাশেদ (২০০১)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : জীবনোপলব্ধির স্বরূপ ও শিল্প*। শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোস্তফা মোহাম্মদ (২০০৭)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য ও সাহিত্যকোষ*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

শহীদ ইকবাল (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস*। আলেয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা

সুশান্ত মজুমদার (১৩৯৯)। 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর'। *লিরিক* [সম্পা. এজাজ ইউসুফী] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা।

সুশান্ত মজুমদার (১৯৯৭)। 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : দ্বৈরথ সমর'। *শৈলী* [সম্পা. কায়সুল হক] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা।